যুগান্তর

তারিখ 12 MAR 2007
পৃষ্ঠা কলাম

মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস

শিক্ষাঙ্গনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে হয় এখন পর্যন্ত 'অবিচলিত' রয়েছে। দলীয় ও জোটগত বিবেচনার ধারাবাহিকতাই সেখানকার বিবেচ্য। ওই সময় ন্যায় আচরণ করতে গিয়ে যারা অন্যায়ের শিকার হয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে তারা এখনও 'শাস্তিযোগ্য'। এরই উল্টো প্রবণতা হিসেবে যারা দলীয় ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ওই আমলে উচ্চতর পদ পেয়েছেন তারা এখন অধিকতর উচ্চ পদের জন্য তদবির ও অন্যায় প্রভাব বিস্তারে মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিগত আমলের দৃষ্টদের লালন যদি চলতেই থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে অন্যায়ই যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হবে তাই শুধু নয়, শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়ে পড়বে।

দলীয় বিবেচনায় এসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অতীতের স্বেচ্ছাচারিতা ও সুবিধাবাদিতার প্রমাণ দিয়েছে। এরা অছাত্র ও তথাকথিত ছাত্রনেতাদের কাছে নতজানু থেকে শিক্ষা-ব্যবসায়ও শিক্ষা রাজনীতি করেছে। একটি উদাহরণ দেয়া যায়। যেসব কলেজে সব বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স রয়েছে সেসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং নীতি থাকলেও গোষ্ঠী ও কোটারি স্বার্থ রক্ষার জন্য সেসবের কোন কোন বিখ্যাত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় বহালই শুধু থাকেনি, প্রতিটি গ্রুপে সেকশন বাড়িয়ে আরও বেশি সংখ্যায় তথাকথিত শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে। এর একটি প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়িয়েছে অনার্স-মাস্টার্সের দোহাই দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস হয়নি, আবার উচ্চ মাধ্যমিকের দোহাই দিয়েই অনার্স-মাস্টার্সে ইচ্ছামতো ক্লাস ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে ভর্তি বাণিজ্যের অবৈধ অর্থ মূলত তথাকথিত ছাত্রনেতারা পেলেও এই উৎকোচের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনের নানা দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনাবলি চাপা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক মহল পর্যন্ত কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তা শুধু কৌতূহলোদ্দীপকই নয়, জাতির জন্য লজ্জাকরও বটে। ভর্তি বাণিজ্যের এই অন্যায় সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর গোঁজামিলও দিতে পারেনি, তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তা 'ওকে' করে দেন। যিনি নকল বন্ধের সিপাহশালার বলে অন্যদের সঙ্গে নিজেও নিজের ঢাক পেটাতেন এবং তোষামোদ বা চাটুকারিতা গ্রহণে অতিশয় সিদ্ধ ছিলেন তার এই 'কর্ম' 'শিক্ষা প্রসারে' কতটা ইতি বা নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল সামান্য কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলেই সহজে তা বোঝা যায়।

দলীয় ও সংকীর্ণ রাজনীতি করার 'ঋণ'কে এভাবেই শুধতে চাওয়া হয়েছে। আর তার ফল দাঁড়িয়েছে সারাদেশে শিক্ষা বিপর্যয়। এজন্য তথাকথিত বিখ্যাত কলেজে কতজন এ গ্লাস করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি বিষয়ে টিআইবি'র ৮ ফেব্রুয়ারির আলোচনা সভায় অযোগ্য অধ্যাপকদের বিদায় দেয়ার যে দাবি উঠেছে কলেজ বা অন্যান্য পর্যায়ে তা করা না গেলেও তাদের অন্যায় সুযোগ পেতে সহায়তা করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ওই আলোচনা সভায় প্রবীণ শিক্ষাবিদ খান সারওয়ার মুরশিদ যে বলেছেন, 'অন্য প্রলোভন থাকলে কারও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়া উচিত নয়' তা শিক্ষার সব ক্ষেত্র ও পর্যায়ে প্রযোজ্য। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, অন্য প্রলোভনই শুধু নয়, অন্যায় সুযোগ নিয়ে ও তদবির করে শিক্ষা প্রশাসনের অধিক থেকে অধিকতর উচ্চ পদ দখল করে এরা নিজেদের ব্যক্তি উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার স্থায়ী ক্ষতি করে চলেছে।

টিআইবি'র আলোচনায় এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তি থেকে ডিগ্রি প্রদানের সব পর্যায়ে চলমান দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের পিএইচডি পর্যায়ের অনেক ডিগ্রিই মানসম্মত নয় কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই তা করুণা উপাধি বা মার্সি ডিগ্রি। কবি আহসান হাবীব যখন 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্য সম্পাদক, তখন ভারতীয় একটি পিএইচডি গবেষণার বিশ্লেষণ করে ওই দৈনিকের পাতায় দেখানো হয়, তা কতটা হাস্যকর ও অন্তঃসারশূন্য। অথচ এসব ডিগ্রির দোহাই দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন পদ দখলের নোংরা প্রতিযোগিতা চলে। টিআইবি'র আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একবার একসঙ্গে বায়ান্নটি প্রথম শ্রেণী দেয়া প্রসঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য যে বলেছেন, শুধু পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক নিয়োগ আর যৌক্তিক নয়। কারণ তাও 'ইঞ্জিনিয়ারিং' হচ্ছে, তেমনি তকমাধারী এসব ব্যক্তির তকমার প্রকৃত ওজনও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তথাকথিত 'সাক্ষাৎকার' এক্ষেত্রে অধিকতর দুর্নীতির জন্ম দেয়। অধিকন্তু প্রাথমিক এই ডিগ্রি সারাজীবন ফললাভের জন্য বিবেচিত হওয়াও অন্যায় ও অযৌক্তিক।

কিন্তু সেই এবং অন্যান্য অন্যায়ই হয়ে চলেছে। এখন সময় এসেছে ন্যায় করার। দুষ্টদের (অযোগ্য, অসৎ ও সুযোগ সন্ধানী) দমন করে শিষ্টদের (সৎ, যোগ্য ও নীতিনিষ্ঠ) পালন করার কাজটি এখনই শুরু করতে না পারলে শিক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হবে না, উল্টো তার ধারাবাহিক অবনতি ঘটতে থাকবে।

মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস : *কলেজ শিক্ষক*

পায় সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কত শতাংশ অকৃতকার্য হয় তার বিশ্লেষণও অত্যন্ত জরুরি। ভর্তি হওয়ার অনুপযুক্ত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে এভাবে যারা তাদের রাজনীতির গিনিপিগে পরিণত করে তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। বলতে অস্বস্তি হলেও তিক্ত এ সত্যের উল্লেখ না করে উপায় নেই যে, মওকাদুরস্ত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের একটি অংশ এর সঙ্গে অনৈতিকভাবে যুক্ত। ফলে তথাকথিত ছাত্রনেতারা শিক্ষক পরিষদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিতই শুধু নয়, নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত করে।

এভাবে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কথা বলা হল তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এমপিরা পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবেন কিন্তু তাদের 'সাহাবিরা' নয় বলে 'আইন' করেছেন, তিনি নিজে যখন অন্য সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেন তখন প্রধানত অছাত্র 'সাহাবি'দের সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তার বক্তৃতার সময় তারা মুহুর্মুহু দলীয় স্লোগান দিত। এতে শিক্ষার কি উপকার হতো সেটা হয়তো তারই ভালো জানার কথা। কিন্তু এই ধারা অনুসরণ করে 'বড়' ও বিখ্যাত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ নিজের ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীন প্রধান দলের স্থানীয় সাধারণ সম্পাদককে তার প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অতিথি করেন।

এখন ঝোপ বুঝে কোপ মারার ওস্তাদ এই ধরনের ব্যক্তিরাই যদি আবার অন্যায় পদায়নের সুযোগ নিয়ে ও উদাহরণ দেখিয়ে অধিকতর সুবিধা নিতে 'সফল' হন তাহলে ন্যায্যতা বলে আর কিছু থাকবে না। আর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষা প্রশাসনের এসব ব্যক্তি যে কার্যত শিক্ষাকেই হত্যা